আমার দুর্গাপূজা

স্বামী তত্ত্বাতীতানন্দ

আজ অনেক দিন পর স্মৃতির পাতা উল্টাতে বসলাম। সে প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। আমি যে মহান সন্ন্যাসীর চরণ স্মরণ করবো তাঁর নাম শ্রীমৎ স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ। যাঁর আদেশ ছিল এ সকল একদিন লোক চক্ষুর সামনে নিয়ে আসা। তিনিই আমাকে সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা লিখে রাখতে বলেছিলেন ও পরে কোন দিন বড় আকারে লিখে প্রকাশ করতে বলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমি তাঁর শরীর অবসানের পর লিখেছি। যাই হোক, তিনি নিশ্চয় আর্শীবাদ করবেন। তাঁর ভালবাসা ও আদেশ মাথায় নিয়ে এই প্রবন্ধ লেখায় ব্রতী হলাম।

আমি বেলুড় মঠে আসি ২০০০ সালে এপ্রিল মাসের ১০ তারিখে। তারপর অনেক ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে আমার জীবন সাধনা এগুতে থাকে। সে সকল সব ঘটনা উল্লেখ করছি না। কিন্তু আমি যে দুর্গাপূজার ঘটনা উল্লেখ করতে যাচ্ছি তার কিছু আগের ঘটনাবলী উল্লেখ অবশ্যই করবো।

১০/০৯/২০০০ সালে বেলুড় মঠের মিশন অফিসের রিলিফ বিভাগের তখন ভারপ্রাপ্ত ছিলেন শ্রদ্ধেয় নন্দকুমার মহারাজ। তিনি শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজীর তত্ত্বাবধানে আমাদের প্রি-প্রভেসনার ট্রেনিং সেন্টারের কয়েকজন ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে সার্ভে করার জন্য লিলুয়া, বালী ইত্যাদি অঞ্চলে বস্তিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। দুর্গাপূজার আগে প্রতি বাড়ীতে বাড়ীতে নতুন জামা-কাপড় শাড়ী ইত্যাদি দেওয়া হতো। আমরা প্রায় প্রতি বাড়ী বাড়ী ঘুরে কোথাও হাঁটু জল কাদা আবার কোথাও বাঁশের শাঁকো বা ঘিঞ্জি কাদা রাস্তা দিয়ে গিয়ে সার্ভে করলাম। ২০/৯/২০০০ তারিখে সমস্ত রিপোর্ট জমা দিলাম। (এ সেবা কাজ সমাপ্ত করে-ই। আবার কিছু দিন পরে শ্রদ্ধেয় স্বামী ঋতানন্দজী আমাদের দায়িত্বে ছিলেন)। তিনি আমাকে শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজীর কাছে পাঠালেন। তিনি আমাদের (আমি ও আমার সাথে অরূপ মহারাজকে) শ্রদ্ধেয় নন্দকুমার মহারাজের কাছে পাঠালেন। রিলিফ বিভাগ থেকে চিঠি ও একটা কম্বল ও বড় ছাতা সঙ্গে নিলাম ও আদেশ দিলেন যেন মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সম্পাদক মহারাজের সাথে দেখা করে চিঠি দিই ও তাঁর আদেশ মত কাজ করি। আমার দু-জোড়া জামা-কাপড় নিয়ে মেদিনীপুর আশ্রমে উপস্থিত হলাম ২৪/০৯/২০০০ তারিখে সেখানে থেকে ২৬/০৯/২০০০ সালে দুই ট্রাকে করে দুই জন পুলিশ সাথে নিয়ে খড়গপুর আসি ও ট্রাক ভর্তি করে চিঁড়ে ও গুড় নিয়ে অরূপ মহারাজসহ ঘাটাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আসি)। প্রায় দুটি গাড়ীতে ১০টন চিঁড়ে ও গুড় ছিল। প্রতিদিন প্রায় ২৭০০ জন মানুষকে, একটি নৌকা করে নিয়ে যাওয়া চিঁড়ে গুড় দেওয়া হত। প্রায় সব বাড়ীগুলি লম্বা লম্বা বাঁশের উপর ছিল। আর দৃশ্য অকল্পনীয়। আমি ও কিছু সেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে একটি মটর লাগানো নৌকাতে যেতাম। অরূপ মহারাজ যেতেন আর একটিতে।মেদিনীপুর মিশনের তৎকালীন ভান্ডারী মহারাজ ছিলেন দায়িত্বে। কিন্তু শেখর মহারাজ-ই আমাদের পরিচালনা করতেন। প্রতিদিন-ই সকালে প্রাতরাশ করে আমরা বেরিয়ে যেতাম দু-তিন ঘন্টা নৌকা চলত একটানা, তারপর কোন একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছতাম। সেখানে বাঁধের উপর বহু মানুষ অপেক্ষা করত লাইন দিয়ে হাতে পাত্র নিয়ে। আমরা যাওয়া মাত্রই কি হুড়োহুড়ি লেগে যেত। কে আগে নেবে কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের সহযোগিতায় আমরা প্রায় সন্ধে ৫টার মধ্যেই দিতে পারতাম। এক এক জায়গায় প্রায় পাঁচ-সাত দিনের খাবার এক সাথে দিয়ে দিতাম। আমাদের আশ্রমে ফিরতে প্রায় ৯টা বেজে যেত। রাতে অন্ধকারে জল, কোনটা নদী বা জমি বা অন্য কিছু বোঝা যেত না। কোন কোন দিন নৌকার মটরের পাখা মাটি বা গাছে বা লতা পাতাতে জড়িয়ে যেত। আর নৌকা

যেতে পারত না, এক জায়গাতে ঘুরতো। আমার খুব ভয় হতো। ঠাকুরকে ডাকতাম। তারপর আর একটা সমস্যা হতো। কোন দিকে যেতে হবে বোঝা যেত না। তখন তো মোবাইল ফোন ছিল না। যোগাযোগের কোন মাধ্যম ছিল না। ঠাকুরের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন গতি নেই। তিনি যা করেন। তখন ঘাটালের একটা একচেঞ্জ অফিসের একটা টাওয়ার ছিল সেটাই দেখে দিক ঠিক করতো মাঝিরা। ফিরতে প্রায় রাত ৯টা বেজে যেত। সকাল থেকে বেরোতাম দুপুরে কোথাও কেউ একটু খাওয়াতো বাড়িতে। প্রতি বাড়িতেই প্রায় জলে ভর্ত্তি। মাছ আর ভাত ছাড়া কিছু হোত না। যাই হোক তাই খেতাম। ২৯/৯/২০০০ তে আমরা সেখানে কিছু হিসাবের কাজ শেষ করে মেদিনীপুর মিশনে ফিরে আসি। সেই সব রিপোর্ট নিয়ে আমি আর অরূপ মহারাজ ১/১০/২০০০ এ বেলুড় মঠে ফিরি। অভিজ্ঞতা আমাদের সঞ্চয় হতে থাকে। কি নিষ্ঠুর প্রকৃতির খেলা। মানুষ কত অসহায় প্রকৃতির কাছে। সে দুঃখ তাদের কাছে নিত্য বছর ঘুরে ফিরে আসে, তাদের কাছে শুনলাম, ব্যথিত হৃদয়ে বেলুড় মঠের নির্দেশে ফিরতে হলো। ১৩/৯/২০০০ তারিখে একটি কবিতা লিখি, তার কলাইন –

এ জীবন নয়; মৃত্যু যন্ত্রণা
এ সুখ নয়;আত্ম পীড়ন
এ সহ্য নয়; অসহ্যের পারে
স্তিমিত সন্ধ্যা প্রদীপের ম্রিয়মান শিখা।

বেলুড় মঠে ফিরে সকল পূজনীয় মহারাজদের সঙ্গে দেখা করি ও তাঁরা সকল বৃত্তান্ত শুনেন। তাঁদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করলাম।

মঠে তখন আনন্দের ঘনঘটা। চারিদিকে সাজো সাজো ব্যাপার। আর কয়েক দিন পরেই বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা। আমার সাধু জীবনের প্রথম বছর আর মঠে দুর্গাপূজা দেখব। সে যে কি আনন্দ বলে বুঝাতে পারবো না। গত দু-বছর স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে মঠে দুর্গা পূজার সময় এসেছি। কিন্তু সে আনন্দের সঙ্গে এখনের আনন্দ তুলনীয় নয়। মা আসছেন, মঠের মূল ঠাকুরের মন্দিরে দুর্গাপূজা হবে। ভিতরেই কাপড় দিয়ে ঘেরা হয়েছে। তৈরী মন্ডপ ও পূজার ভান্ডার। কি আনন্দ। সময় আর ফাঁক পেলেই মাঝে মাঝে মন্দিরে ঢুকে দেখে আসতাম। প্রথম থেকেই ঠাকুরের ভান্ডারে আমার যাওয়ার অনুমতি ছিল। তাই বেশী আনন্দ যে দুর্গাপূজোতে অংশ নিতে পারবো। ১/১০/২০০০ তে প্রি-প্রভেসনার ট্রেনিং সেন্টারে ফিরলাম। নতুন দুটো জামা ও ধুতি পেলাম পূজার জন্য। কি আনন্দ! অনেকদিন বাইরে থাকার পর সবার সাথে দেখা, আমাকে সকলেই খুব ভালবাসতো। সব থেকে ছোট ছিলাম। ২/১০/২০০০ এর বিকালে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী আবার অফিসে ডাকলেন। আমার শরীর ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ঠিক আছি বলতেই তিনি আমাকে আবার রিলিফে যাওয়ার কথা বললেন। বললেন খুব প্রয়োজন আছে যেতে হবে। আমি আদেশ শিরোধার্য করে পূজনীয় নন্দকুমার মহারাজের সাথে দেখা করি। তিনি পরের দিন (৩/১০/২০০০) সকালে প্রাতরাশ করে সারদাপীঠের পূজনীয় স্বামী রমানন্দজীর কাছে পাঠালেন। সেখানেও কিছু খেলাম, তারপর ওখান থেকে কয়েকজন মহারাজের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। সঙ্গে পূজনীয় দেবাঞ্জন মহারাজও ছিলেন।

ঐদিন ৩/১০/২০০০ মহাষষ্ঠীর সকাল বেলা আমার যাত্রা শুরু। ঐদিনের কিছু বিশেষ ঘটনা বলতেই হয়। আমার বুকের ভিতর যে পরিমান কষ্ট হচ্ছিল, তা আজও দুর্গাপূজা আসলে তার প্রতিক্ষণ মনে পড়ে। যেন মনে হত এ-বছর প্রথম দুর্গাপূজা দেখবো আর আনন্দ করবো। সে যে কি ভাবনা সকল মনের মধ্যে তোলপাড় করতো কি বলি! ঠাকুর কি চান তিনি জানেন! এই সকল কেন করাচ্ছেন। আমি তো এই মাত্র দুটো রিলিফ থেকে ফিরলাম। তিনি কি চান তিনিই জানেন। সকালে ঠাকুর প্রণাম করে নাট মন্দিরে যেখানে দুর্গাপ্রতিমা সাজানো হয়েছে, সামনের দুই পিলারের মাঝে মুখটা ঢুকিয়ে দিয়ে খুব কাঁদছি, যাতে কেউ দেখতে না পায়। বুকের ভিতর কি তোলপাড় আর কষ্ট পাচ্ছিলাম ভাষা দিয়ে বলতে পারবো না। আমার বয়স তখন কুড়ি এর একটু বেশী হবে। এখন মনে হয় এই তো সে দিনের ঘটনা। পূজনীয়

অম্লান মহারাজ, (স্বামী নিত্যকামানন্দজী) এখন সেবা প্রতিষ্ঠানে সম্পাদক মহারাজ, আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি আমাকে কাঁদতে দেখে বললেন কি ব্যাপার! স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজও এরকম দুর্গাপূজার সময় রিলিফ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর ভাব ও আদর্শ ছিল জ্যান্ত মানুষের পূজা, জ্যান্ত মা এর পূজা। আমি তখন ও সব কথা শুনছি বটে, কিন্তু ভিতরে কান্না চাপতে বা বুঝতে চাইছি না। যাই হোক কি আর করা যাবে অগত্যা বড়দের আদেশ মেনে নিয়ে এক কম্বল এক ছাতা ও জামা কাপড় কিছু ব্যাগ নিয়ে সারদা পীঠে এসে পৌঁছলাম। আর কারও দিকে মুখ উঁচু করে তাকাচ্ছিলাম না, যাতে কেউ দেখে না নেয় আমার ভিজা চোখ গুলি, আবার কাঁদতে শুরু করি। গিয়ে দেখা করলাম স্বামী রমানন্দের সাথে। তিনি আমাকে সারদাপীঠের একটি গাড়িতে উঠতে নির্দেশ দিলেন। আমি ব্যাগ পত্র নিয়ে উঠলাম।

প্রথম দিন ৩/১০/২০০০ প্রায় দশটা, সাড়ে দশটার সময় আমরা বলাগড় (হুগলী) তে পৌঁছাই। এখানে বলাগড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড ক্যাম্প ছিল। এটি জিরাট স্টেশন রোডে ছিল, এখানে কোন এক স্বেচ্ছাসেবককে দিয়ে একটি সাব রিলিফ সেন্টারে পাঠানো হয়। রাকেশপুর প্রাইমারী রিলিফ ক্যাম্পে ট্রাকে বোঝাই চিঁড়ে গুড়ের উপরে বসে পৌঁছালাম। যখম সেখানে পৌঁছালাম অনেকে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে। যাই হোক দুর্গাপূজা শুরু হোল। সেদিন মহাষষ্ঠী। জ্যান্ত দুর্গা মায়েরা দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে ঐ সামান্য চিঁড়ে গুড় পাওয়ার জন্য। কি পরম তৃপ্তি তাদের চোখে মুখে আজকের দিনটা খাওয়ার জন্য চিন্তা হবে না। আমাদের যখন দেওয়া শেষ হল তখন দুপুর পেরিয়ে বিকেল চারটে। কিছু খাওয়া হয়নি। মাঝে মাঝে জল খেয়েছি শুধু। কোথাও কোন খাবার পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এরাই পাচ্ছে না আর আমাদেরকে দেবে খাবার! যাই হোক আমরা সকালে খালি বস্তা নিয়ে গ্রামের মধ্যে হেঁটে হেঁটে এগুচ্ছি মেন রাস্তার দিকে, এমন সময় একজন বলল মহারাজ এখানে একটি পুরানো দুর্গা মন্দির আছে, একটু দর্শন করে যাবেন। আমি তো কোন কথা না বলেই সোজা মন্দিরের দিকেই চললাম। মন্দিরে মাকে প্রণাম করে বেরিয়েছি, এমন সময় একজন সাধু, যিনি ঐ মন্দিরেই থাকতেন। তিনি এসে বললেন মায়ের আদেশে তিনি খিচুড়ি রেখেছেন।

তিনি যা ভিক্ষা করে নিয়ে আসতেন তা দিয়েই ভোগ রান্না করে মাকে নিবেদন করে গ্রহণ করতেন। আমি তো একথা শোনা মাত্রই শ্রীঠাকুর, দুর্গা মায়ের কৃপা ইত্যাদি ভেবে বার বার ধন্যবাদ জানাতে লাগলাম। কিন্তু যে পরিমাণ খিচুড়ি ছিল তা শুধু একজনেরই হবে। তিনি আমাকে খেতে বললেন। কিন্তু আমি একা এদের বাদ দিয়ে খাই কি করে। ওরাও তো কিছু খায় নি। তখন অগত্যা তাই হাতে হাতে একটু একটু করে নিয়ে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করলাম।

আজও সুস্পষ্ট মনে আছে। ও কথা মনে করে আজও ভাবি মায়ের কি অশেষ কৃপা! যাই হোক, সন্ধ্যের পর আমরা আবার বলাগড়ে যে প্রধান ক্যাম্প ছিল সেখানে ফিরলাম। স্বামী রমানন্দজী ঐ ক্যাম্পে দিনে ছিলেন ও রাতে সারদা পীঠে ফিরেছিলেন। আমরা রাতের খাবার খেলাম একটি হোটেলে। রাত্রে ঘুমানোর জন্য যে জায়গা পেলাম সেটা হচ্ছে যেখান থেকে জনসাধারণকে কেরোসিন তেল দেওয়া হয় সেই একটু উঁচু বেদীর মত করা জায়গাটি। লম্বা লম্বা করে দুজন শুয়েছিলাম মনে আছে। তেল চিট চিটে মেঝেতে কম্বল পেতে শুয়েছিলাম। গায়ে একটা চাদর ছিল। মশারিও দিয়ে ছিল। কিন্তু সারারাত তেলের গন্ধ ও মশার কামড়ে ঘুম আর হয়নি। প্রত্যেকটি ঘন্টা চোখ বন্ধ করার চেষ্টাতেই কেটে গিয়েছে।

যাই হোক, ঠাকুরের যেমন ইচ্ছা মনে করে রাত কেটে গেল। সকাল বেলাতে আবার খবর এলো আমাকে এখান থেকে আরেকটি বড় ক্যাম্প একতারপুর (হুগলী) তে যেতে হবে। আবার কম্বল ও ছাতা ব্যাগ গুছিয়ে আবার একটা মটরসাইকেলে উঠলাম। পৌঁছালাম নয়টা নাগাদ। রাত্রে রাকেশপুরের ছবি ও গল্পগুলো মনে আসছিল - যখন আমরা ট্রাকে করে পৌঁছালাম, যাওয়ার সাথে সাথে বন্যার্ত মানুষেরা ছুটে প্রায় ঘিরে ফেলে আমাদের। ঐ

বন্যার্তরা নদীয়া থেকে গঙ্গার ওপার থেকে এসেছে। নদীর এপার হুগলী। তাদের মুখে শুনলাম। ওখানে অনেক উঁচুতে জল উঠেছিল। মাটির কোন বাড়ী নেই। গাছ পালা অনেক পড়ে গিয়েছে। ফাঁকা করে দিয়েছে সব। অনেক পশু মারা গেছে। বন্যার জল ঢুকে পড়ায় ক্ষতির পরিমাণ বেশী। তাদের মুখে একটা ঘটনা শুনে অনেক কষ্ট হল, তা রাতেও খুব মনে পড়ছিল। একটি চার-পাঁচ বছরের ছেলে ও তার দিদি প্রায় ছয়-সাত হবে, তারা দুজনে গঙ্গার জলে ভাসমান পানা ধরে ভেসে ভেসে সেই রাত থেকে সকাল নটা পর্যন্ত এসেছে। তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। ওখানের লোক গুলো নৌকা নিয়ে ধরতে পারেনি। পুলিশ স্পিড বোট করে ধরেছে। তাদের আর কোন খবর নেই। বাঁচছে বা মরেছে। ঐদিন ১৪০০ পরিবারকে খাওয়ার দেওয়া হয়েছিল। অনেকের কষ্টের কথা শুধুই মনে আসছিল।

আমার সপ্তমী পূজা শুরু হল একতারপুরে। ওখান থেকে একজন মোটর সাইকেল করে নিয়ে যায়। আমি প্রায় নটায় পৌছালাম। থাকার ব্যবস্থা ওখানের প্রবুদ্ধ ভারত নামে সংঘ বাড়িতে। মাটির ঘর, টালি দেওয়া চাল। একটা ঘর ও বারান্দা আছে। অজস্র জিনিস পত্র তার মধ্যে থাকতে হবে। পূজনীয় যোগেশ মহারাজ দায়িত্বে ছিলেন। উনি আমাকে বললেন, তোমাকে হিসেব দেখতে হবে, সঙ্গে সব কে কি করছে দেখ। আমি তো ভাবছি এত বড় কর্মকান্ড আমি কি করে দেখবো। যাই হোক যেন সব জানি এরকম ভান করে সবার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। প্রতিদিন প্রায় ১০,০০০ জনের খিচুড়ি রান্না হত। পাঁচটা উনুন তৈরী ছিল। ভোর রাত থেকে রান্না শুরু হত। আর আমি ঘুরে ঘুরে দেখতাম। পঁচিশ ত্রিশজন শুধু রান্নার জন্য ছিল। মঠ থেকে চাল ডাল সব যেত। বাইরের কিছু সংঘ থেকেও ট্রাক করে জিনিসপত্র আসতো। সে সব নামানোর দায়িত্ব আমার উপর, তাদের সাথে কথা বলা,যারা বাইরে থেকে আসতো তাদের সাথে সমস্ত আদান প্রদান আমাকে দেখতে হত। যাই হোক, শ্রীঠাকুর, শ্রীমা এবং স্বামীজীর কাজ দেখতাম কি ভাবে সুন্দর ভাবে হয়ে যেত। আমাকে প্রতিদিনই কোন না (সাব-ডিস্ট্রিবিউশনসেন্টার) বিতরণ কেন্দ্রে যেতে হত। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। না চোখে দেখলে বুঝতে পারতাম না। আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

একটি দিনের ঘটনার কথা বলি, সে দিন যথারীতি ট্রলিতে করে ড্রাম ভর্তি খিচুড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যে রাস্তায় বিতরণ হবে সেই রাস্তার দুদিকে ত্রিপল দিয়ে সারি সারি ঘর তৈরী করা আছে। আমরা যত এগিয়ে যাচ্ছি প্রায় গায়ে কিছু নেই এমন সব মানুষজন হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে। আর টিফিন ক্যারি মাটিতে রাখা। বুঝলাম খিচুড়ির প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। মা মহামায়ার পূজো চলছে আর জ্যান্ত মায়েরা একটু খিচুড়ির জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যিই কি দুর্বিষহ। দেওয়া শুরু হল। আমি হাতে করে কয়েকজনকে প্রতিদিনই দিতাম। সেদিনও দেওয়ার পর পাশে হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। 'আপনারা না খিচুড়ি নিয়ে আসলে আমরা না খেতে পেয়ে মারা যেতাম। আপনারা আমাদের বাঁচিয়েছেন।' এরকম কত ভিন্ন কথা প্রত্যেকেই বলছে আর আনন্দে ফিরে যাচ্ছে। আর আমি চোখের জল সামলাতে পারছি না। আমি জ্যান্ত মায়ের পূজা হচ্ছে, সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমি ভাবিনি ঠাকুর আমার হাত দিয়ে পূজা নেবেন এই ভাবে। যত দিন ছিলাম ততদিন এই ভাবেই যেতাম। ফিরে আসতে অনেক বেলা হয়ে যেত। যোগেশ মহারাজ অপেক্ষা করতেন ফিরে এসে এক সঙ্গে খিচুড়ি খেতাম। মাঝে মঝে পাশের একটা বাড়ী থেকে কিছু তরকারি অবশ্যই পেতাম।

একদিন এক বিশেষ ঘটনা হল - পরম পূজনীয় স্বামী শ্রীকরানন্দজী, পূজনীয় স্নেহময় মহারাজ, পূজনীয় দেবু মহারাজ (০৭/১০/২০০০) সকালে আমাদের ক্যাম্পে আসেন ও সারাদিন ছিলেন। সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখেন। দুপুরে ওই মাটির ঘরে যেখানে আমরা থাকতাম বা খেতাম সেখানেই সকলে খেলেন। আমি সকলকে পরিবেশন করলাম। সেদিন খিচুড়ির সাথে চাটনি ও কিছু তরকারী পাশের বাড়ী থেকে দিয়েছিল। তা মহারাজদের দিলাম। খাওয়ার পর পূজনীয় স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, মিষ্টি আছে? আমি বললাম না মহারাজ, ভয়ও পাচ্ছি ওনারা কত প্রাচীন সাধু আর ওভাবে কথা বলছি। যাই হোক মহারাজ বললেন, 'জানিস

কথাই আছে মধুরেণ সমাপয়েৎ' আমি ঘাড় নাড়লাম। পাশে রান্নার জন্য গুড় রাখা ছিল, আমি বললাম মহারাজ গুড় দেব? মহারাজ, তাই দে। মহারাজকে একটু গুড় দিলাম। শুনেছি মহারাজ খাওয়ার পর মিষ্টি একটু হলেও খেতেন। যাই হোক সেদিন এভাবে গেল। বিকেলে একটু দূরে একটি বাড়ীতে (তাঁরা রেশনের ডিলার ছিল) মহারাজদের নিমন্ত্রণ করলেন। তখন রোদ আছে। আমরা সকলেই গিয়েছি। পূজনীয় শিবময়ানন্দজী মহারাজ নিজেই ছাতা ধরেছেন। আমি পূজনীয় শ্রীকরানন্দজী মহারাজের মাথায় ছাতা ধরেছিলাম। উনি খুব লম্বা ছিলেন। আমাকে তাই হাতটা খুব লম্বা করে ধরতে হয়েছিল। কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর উনি আমার হাত থেকে ছাতাটা প্রায় কেড়ে নিলেন। নিয়ে নিজেই আমার মাথায় ছাতা ধরে পুরো রাস্তা নিয়ে গেলেন। আমার ভিতরে ভয়, দ্বন্দ্ব, শ্রদ্ধা, আবেগ সব মিলে মিশে একাকার। কোথায় আমি এই মাত্র সংঘে যোগদান করেছি,আর উনি কোথায় সহকারী সাধারণ সম্পাদক। কি করি, অগত্যা সেইভাবেই যেতে হল। আমরা ওখান থেকে জলযোগ করে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। প্রায় বিকেলে মহারাজ সকলে আবার গাড়ি করে মঠে ফিরে গেলেন। সেদিন আনন্দ, আবেগ মিলে ভাল কাটল।

পূজনীয় শিবময়ানন্দজী যাওয়ার সময় বললেন তুই তোর সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলো লিখে রাখিস, পরে বড় করে লিখিস। আজ তিনি আর এ মর্ত্যধামে নেই, তিনি যে এভাবে শরীর ত্যাগ করবেন তা ভাবতে পারিনি। শ্রীঠাকুরের যেমন ইচ্ছা। তাঁর আদেশ মনে করে আজ লিখছি। তিনি সদা স্নেহ করতেন তা আজ বুঝতে পারতাম। যখনই যেতাম তাঁর কাছে বুঝতে পারতাম। কত সাবলীল তাঁর জীবন ধারা। তাঁর কাছে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। কোন রকম নিয়ম ধারা ছিল না। যে অপূর্ব ভাব। সাধারণের মধ্যে অসাধারণ তিনি ছিলেন।

পূজনীয় শ্রীকরানন্দজীও খুবই সাধারণের মতো থাকতেন আর আমাকে ভালোবাসতেন। পরবর্তীকালে ওনার অফিসে গেলে বসিয়ে কথা বলতেন। অনেক ঘটনা তো আছে, কিন্তু এখন দুর্গাপূজোই হোক। পরে কখনও সেসব কথা বলা যাবে। অষ্টমী পূজো সেবার ৫/১০/২০০০ এ হয়। সেদিন বারাসাত নামে একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখান ২৮৯ জনকে ময়দা, গুড়, ঘি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। আমি কিছু জনকে দেওয়ার পর সকলকে স্বাক্ষর করাচ্ছিলাম। আর তিন জন স্বেচ্ছাসেবক সব দিচ্ছিল। তারা সকলে জিনিস পেয়ে খুব খুশি, কারণ সে দিন মহাঅষ্টমী ছিল। বাঙালীরা সাধারণত ঐদিন ভাত খায় না। মায়ের পুজো দিয়ে লুচি তরকারি খায়। তাই আমার পুজো সার্থক হল। ৬/১০/২০০০ ও ৭/১০/২০০০ দুদিন নবমী ছিল সেই বছর। দুদিনও এভাবে দুটি গ্রামে যাই ও বিতরণ করা হয়।

৭/১০/২০০০ দিন কোথাও যাওয়া যায়নি আমি রান্নার কাছে ছিলাম। তদারকি করা, আর কাছে থাকলে সব ঠিকঠাক চলতে থাকে। ওদিনই পূজনীয় স্বামী শিবময়ানন্দজী, পূজনীয় স্বামী শ্রীকরানন্দজী, স্নেহময় মহারাজ ও দেবু মহারাজ সেখানে যান। ক্যাম্পে আসাতে আমরা খুব আনন্দিত হই। বিস্তারিত ঘটনা আগেই বলেছি।

৮/১০/২০০০ দশমীর দিনও আমি কোন বিতরণে যাইনি। ঐদিন ক্যাম্পেই ছিলাম এবং রান্নার কাজ দেখছিলাম। বিকেলে দুর্গামায়ের বিসর্জন হয়ে গেছে। পূজনীয় যোগেশ মহারাজ আমাকে বললেন দুর্গাপ্রতিমা একটু দর্শন করে আসতে। চারিদিকে জল কোথায় যাব।একটি জায়গাতে জল না উঠায় বাজারের মধ্যে একটি দুর্গাপূজা হয়েছিল। সেইখানে মোটর সাইকেলে করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। দুর্গাপূজা আমার এই ভাবে কাটার পর সেদিন প্রতিমা দর্শনে গেলাম। যাই হোক প্রণাম ও দর্শন করে ফিরে এলাম। সারা পুজো জ্যান্ত মায়েদের পুজোতে কাটলো। দশমীতে সে মা সকলের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করলেন। আর কয়েক দিন আমরা একই ভাবে রিলিফ করলাম। একদিন ঐ সংঘে ঠাকুরের আরতি গান করি। সে ক্যাম্প লক্ষ্মী পুজোর আগের দিন শেষ হয়। পরদিন আমাদের মঠ থেকে গাড়ী করে নিয়ে আসে। অনেক দিন পর মঠে ফিরলাম। শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজীকে প্রণাম করে অন্যান্য সকল পূজনীয় মহারাজদের প্রণাম করলাম। আমার দুর্গাপূজা সম্পূর্ণ হল। ■